স্বনির্বাচিত কবিতা

শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অসাড়লিপি (অংশ)

১

নিজেকে কতবার পালাতে বলেছি, অশ্রাব্য খিস্তির সামনে বারবার জিভে চলে আসা বালি সমেত তাকিয়ে থেকেছি এই না যেতে পারা অসাড়ের দিকে, প্রবল অতীত নিয়ে বদ্ধ দুটি মাত্রার বাক্সে ছটফট করা

যখন অসাড় ওঠে এই দীর্ঘ সূর্যের শহরে সামনে শুধু বারবার কেটে যাওয়া নিউরোনের ফ্যাকাশে সাদা গলিগুলো দিয়ে ঢুকে পড়ে হাতিশুঁড়ের গন্ধ, জিভ ও আমাদের মানতের সুতোর ঘিনঘিনে বটবৃক্ষে গিঁথে দেওয়া আমাদের থ্যাঁতলানো জিভে ক্রমাগত অচেনা ভাষা গুঁজে দিয়ে পালায়।

যখন অসাড় ওঠে এই অবশিষ্ট শব্দগুলো কান্নার আগে মুখে ঠুসে দিয়েছে একটুকরো নিভে আসা কাঠ – কিছু ছাইয়ের গুঁড়ো নিজেদের না চিনেই উড়ে বেড়াচ্ছে মগ্ন

অথচ অসাড়ের হাত ধরেই চাষি রমণীর পুরুষ্টু পায়ের চাপে তার আঙোটের রূপোলি ধেবড়ে দিয়েছিল বাসস্টপে, মেট্রো স্টেশনে

যে তীব্র বমিভাব লুকিয়ে হাঁটা এই অসম্ভব যানপ্লাবিত অসাড়ে একধরণের ভাঙা কাঁটাতারে ঘেরা ব্যাকইয়ার্ড খুঁজছো তুমি, কমলা বেড়ালের পালিয়ে যাওয়ার মিশিয়ে দিতে চাইছো সকাল থেকে শুরু হওয়া মাথার যন্ত্রণা

যখন অসাড় ওঠে আর ছড়িয়ে যায় তার রং, সে জৃম্ভনে তুলে নেয় শান্ত খিদের জংধরা ধাতু – আর কিছু নেই শুধু এক বিরাট প্রচেষ্টা নামক হাতুড়ি, খণ্ড করে দিতে থাকে পেশি ও সমূহ – আমি ঢুকে আসি নিবিড় চূর্ণে রক্তশূন্য এক সকালের গায়ে লিখে রাখতে চাওয়া আঁচড় ও শেষবারের মত দাঁতে দাঁত চোয়াল শক্ত করা পরিশীলিত ব্যাকরণ

ধেবড়ে থাকা সত্যিগুলো আর কোনও কাজে লাগছে না – শুধু এই ক্রমশ ক্ষয়ে যাওয়া যাতায়াতের শরীরে কেউ মাথা তুলছে না – এক দীর্ঘ মানুষ ও পশুর দলবদ্ধ বিস্ফার সমস্ত গলির বুকে সমস্ত দরজা ও জানলার আলোকছিদ্রের বুকে আটকে আছে অসাড়ের চোখ ধাঁধানো তীর

আর কিছুতেই কাউকে ডেকে তোলা যাচ্ছে না, সকলেই সারিবদ্ধ, পরপর অ্যাভেনিউ বৃক্ষ জুড়ে সাজানো রয়েছে বাসন, শব্দ হচ্ছে, পত্রমোচনের কাছে নিয়ম মাফিক সঙ্গম ও শরীরের চাহিদাগুলো দাঁতে ছিঁড়ে আনতে চাইছে স্তনাগ্র, নখের দাগ রেখে যেতে চাইছে সর্বত্র, বিশ্বাস করতে শিখছি প্রশ্নহীন অনুশাসন,

দীর্ঘ বালির পথে ছড়ানো থাকছে ধাতব বিন্যাস, দীর্ঘ নদীপথে ভেসে আছে ত্যক্ত নৌকা; এই যাবতীয় দৃশ্যের প্রাকার জুড়ে গড়িয়ে পড়ছে অসাড়ের মোম

অতিকায় ক্যালেন্ডারের শেষ হয়ে আসা দিনগুলোর উপর উলকি করা থাকছে আমাদের যাবতীয় জীবাণুসঙ্কুল কথা; খাদ ও তার পাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো রাত্রি নামক কন্দ, সমস্ত নক্ষত্রই জল – তাদের অস্পৃশ্য খোলস; শুধু বাহনের দ্রুতি কাটিয়ে চলেছে দরজা নামক রাস্তার মাঝখানে বসানো কিছু ফাঁপা অভ্যেস

এই উঠে বসা, শোয়া বা অন্যান্য ভাঙনে
যতটুকু শরীর থেকেছে তার চেয়ে বেশি অভ্যাসের
ভঙ্গিমা আয়ত্ব করে চুপচাপ সেতুটির কাছে
রেখে গেছি এই মর্ম, এই সন্ধে নামক স্তব্ধ টুকরো

তোকে চেয়েছি, বলার শব্দের চেয়ে বেশি
লেখার গায়ে স্বাধীনতা
নেশা বা রাস্তার মোহে তোকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি
চূড়ান্ত পিচ্ছিল পথে দেয়াল থেকে ইঁটে
কংক্রিট থেকে অব্যবহৃত ঋণপত্র পর্যন্ত
বারবার মাংস এসে কামড় মেরেছে ক্যালেন্ডারের ধাতব আকরে

এই লেখার বস্তুত কোনও অর্থ নেই যতক্ষণ না আমি এই ভাষা থেকে বেরিয়ে আসছি, এক উৎকট ফোম জঙ্গলের মধ্যে প্রচলিত আমার বারবার বেরিয়ে আসতে চাওয়ার ছটফটানিগুলো যতক্ষণ না শান্ত হয়, আমি নিবিড় একটা গাছতলার চায়ের দোকানে পান করা আতঙ্কের সিগারেটের আরাম ছড়িয়ে দিতে পারি এই চিঠিতে

হ্যাঁ এভাবেই কথা বলে রাখা প্রয়োজন, কারণ যখন অসাড় জেগে উঠে চুরমার করে দেয় আমার এতদিন পর্যন্ত জানা বোধ বা সিঁড়িতে আচমকা পায়ের শব্দ থেকে নিষেধ মুদ্রাসহ জিভ ছিঁড়ে আনা চুম্বন পর্যন্ত ভাষা আঁকড়ে রেখেছে বালির কর্কশ

আসলে বহুদিন নারী শরীরের স্পর্শ পাইনি আমি ক্রমাগত রসুন নিয়ে চাটতে চাওয়া জিভ মেলে দিইনি যোনির কর্কশে এই ক্রমশ হারিয়ে যাওয়া তারিখের পাতায় ভরে রাখছি রোমশ দেহ আমার না হওয়া ক্লান্তির ওপর গড়িয়ে দিচ্ছি আত্মরতির ধাতব ডেলা

এইভাবে যে যুক্তির বিন্যাস, তার পাশে ফেলে দেওয়া চকিত বালকের একপাটি টায়ারের চটি, স্ট্র্যাপ ছেঁড়া – আমাকে কোথায় নিয়ে ফেলতে চাইছে? যখন অসাড় এক প্রাত্যহিক নক্ষত্রের মত উঠে ভরে দিচ্ছে শহর ও তার জ্বর – সমস্ত সন্তর্পণ গলি ভরে থাকছে পেলেট গানের ক্ষত নিয়ে হাঁটা কিশোর – আর কোনওদিন দেখতে পাবে না – একটানা খালি গলার দেবব্রত বিশ্বাস পাকিয়ে উঠছে আমার সামান্য বেঁকে যাওয়া কলমের ডগায় – যেন আচমকা বিকট শব্দ করা মোটর সাইকেল ছিঁড়ে দিয়ে গেল সন্ধে – যন্ত্রণা নামক দীর্ঘ পতাকা নিয়ে তোমরাই বা কোথায় চলেছো?

সন্তান হত্যার নিপুণতায় তোমাকে টুকরো করব
পরাজয় – আচমকা ঠিকরে ওঠা রৌদ্রের পরিখায়
উজ্জ্বল এক পাথরের মত

এভাবেই তো প্রতীক্ষা চিরকাল দাঁতে দাঁত
নিজের মাংসের গায়ে যেভাবে জড়িয়ে
এই ঔজ্জ্বল্য নামক অনভ্যস্ত সময়খণ্ডে
আমি স্থির বিঁধে রয়েছি
এক কর্কশ তূণীরহীন তীর

ধরো এভাবে হঠাৎই এসে পড়া তোমার গোত্রহীন প্রাচীন জনপদে শতাব্দী পেরিয়ে একধরনের ম্লান অবিশ্বাসের কাপড় মেলা রয়েছে অবিশ্রাম রাস্তার পাশে – তুমি প্রশ্ন কর কতদিন আছো তোমরা? উত্তর জানার আগেই তুমি বুঝে নাও তুমিও এই জনপদেরই অংশ – যেখানে কোনও বিদেশি অশ্বারোহী, বিশ্রামের পরে যে সাময়িক আলস্য থাকে তাতেই গা এলিয়ে থেকে গিয়েছিলেন এই পাতলা ও সামান্য নৌ-চলাচলের দেশে। তোমার রক্তে এই নামগোত্রহীনতা। এখানকার দীর্ঘশ্বাসী মেয়েদের বিকেলদীর্ঘ চুলবাঁধার কালো ফিতে, ফ্যাকাশে হয়ে আসা ব্লাউজের সুতো তৈরি করে দিয়েছে তোমার স্নায়ুকোষের এবড়ো খেবড়ো। তুমি গুছিয়ে কথা বলার আগে পড়ে যাও অন্যের কথার তেজে – বুঝে যাও যে পুরুষ এই খালবিলের দুনিয়ায় ঘুনি পেতে ভুলে গেছে মাছ তুলতে – যে পুরুষ পৌষের রোঁয়া তোলা সকালের শরীর থেকে বের করে এনেছে স্বচ্ছ তাড়ি – তারপর কোনও রাস্তাই রোজগারের দিকে যায় না শতক ও দশকে – শুধু মুখ বদলের পরিচিতি যে আধো- অচেতন বদলগুলোকে আলতো লেপে দিয়ে গেছে শব্দভাণ্ডারে, তুমি তাকে অভিধানের সমাধিক্ষেত্রে তুলে নেবে ভেবেছো আর এভাবেই উঠে গেছে ক্রমশ আকাশের দিকে পাখির চোখে অজস্র গ্রাম ও গোত্রহীনতা – অজস্র ছোট শহরের দম বন্ধ করা কৌতুহলী বাড়িগুলোর দরজা – আচমকা খেতের আলে শুয়ে থাকা কিশোর পুরুষের চোখের সামনে প্রতিদিন দ্বিতীয় প্রহরকালে ঋতু নির্ভরতাহীন অসাড় গোটা এলাকা ধাঁধিয়ে জেগে উঠেছে; পশুবলির রক্তে তাকে ঠেকান যাবে না

পরপর নেমে আসছিল টোপ মাটি ও নদীর ওপর
সমস্ত না লেখা শব্দ ও উচ্চারিত হারিয়ে যাওয়া কথাগুলো
জমে লাল মাংস
উঠে গিয়েছিল আকাশে
দীর্ঘ শতাব্দীসমূহের হারানো বাক্যগুলো
গাঢ় থকথকে মাংস হয়ে নেমে আসছে

স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ঘোলাটে জলে মাছ ও বোদমাটির নরমে
পশুদের নিরন্তর
সেই মাংসের জন্য দৌড়ের আওয়াজ
প্রতিযোগিতার গর্জন

বাকি পৃথিবী শান্ত
দীর্ঘ ইতিহাস ও হারানো শব্দ গিলে
ফুলে ওঠা অসাড় তাপ ছড়াচ্ছে

পরপর মিথ্যেগুলো উঠে যাচ্ছে
ফ্যাকাশে লাল কানকোর মত লোভনীয়
শিকারি পাখির খাওয়া বা তার ঠোঁট ফসকে নেমে আসা
নদী খাল ও অন্যান্য জলে
নিবিড় মিথ্যে

প্রাথমিক যৌনাকর্ষণকে প্রেম
ইতিহাসের পরিহাসময় পুনরাবৃত্তির ভুল সময়
সমস্ত মাংসপিন্ড নেমে আসছে
পরমের সুগন্ধ ও লোভে
জড়ো হচ্ছে প্রাণীরা
তাদের বিকট জল ঝাপটানোর শব্দ
কল্পনা করে নিচ্ছি তাদের সূর্যাস্তরঙা পিঠ
ও ক্রমাগত মাংস গিলে ভার
তাদের পৌষ্টিকতন্ত্রের আধারে জড়ো হতে থাকা
আমাদের যাবতীয় পপ দুনিয়ার অঙ্গীকার

যখন অসাড় ওঠে
আমাদের খালে নদীতে ছড়িয়ে যায় বিভা
পাড়ের সমস্ত গাছ যেন মোমের তৈরি
এই নাজুক শ্রাবণ মেঘের তলায় অসাড় দেখে নুয়ে পড়েছে
তাদের পাতা ও না হওয়া ফল
স্পর্শ করছে মাংসে ভরে থাকা জল
তাদের তলা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে
মিথ্যে গিলে ফুলে থাকা জলজ জন্তুদের
চলাচলের ভারি স্রোত

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম নিশ্চুপ শরীরের গন্ধে আশিরনখ শীতশেষের ভাললাগা সমেত মাথা পেতে হাত তুলে দিলাম মুহূর্তের তালুতে জিভে স্তনবৃন্তের শিহরণে – আলগা কামড় ও লালা সমেত – অদূরে কোথাও এক দীর্ঘ সুরেলা ডাবল বেস – ইসলামি স্থাপত্যের গা থেকে খসে যাওয়া পায়রা ও গম্বুজ মাখা বিকেল, আসলে তেমন কিছু নেই, শব্দ ও বিন্যাস নিয়ে শুধু দীর্ঘ শ্বাসাঘাত প্রবণ অসাড়ের থাবা মৃদু নখ বুলিয়ে রাখছে এই সময় নামক বালিতে

না দেখা মানে কি একটা ভুলে যাওয়া পুকুর পাড়ের কথা? স্মৃতিতে কিছুই বাড়ে না, শুধু দীর্ঘ হয়ে ওঠে হারিয়ে যাওয়াগুলোর ছায়া – একটা কদম গাছ ও তার অকাল চৈত্রের হলুদ গোল পুষ্পসম্ভাবনাগুলো কখন যে থেঁতলে দিয়ে গেছে অসাড়!

এভাবেই দিনগুলো ইতিহাসের ঠোক্কর খাওয়া দশমিক প্রহর – কিছু নিজেদের জলে ভাসিয়ে দেওয়া কৃষক, কিছু নিজেদের জিভ চিবিয়ে খাওয়া চাষা কাঁটা হয়ে ফুটে থাকে – আর এই সবকিছু নিয়ে দিনের টুকরো ভাস্বর ও আলো লেগে চোখ ধাঁধানো – ক্রমাগত নেমে আসছে আমাদের জানলার ধারে রাখা বইগুলোর মলাটে – আমাদের পড়া হচ্ছে না কিছুতেই – পাতায় জমে থাকা হলুদ শোষণ করা শুভকাজ – আমাদের অবিশ্বাস্য রকমের রোগা চেহারার উপর ভুঁড়ি, ৭ মিনিটে শেষ হওয়া যৌনতা ও আড়চোখে পোস্টার দেখা সমেত যাবতীয় তঞ্চকতা, হাঁটু গেড়ে বলা প্রেম সমেত সোজা হয়ে দাঁড়াচ্ছি, অথচ অসাড় উঠে খুলে দিচ্ছে নতুন রেডিও – কোথাও খবর নেই শুধু বিশ্রামহীন গানের সুড়ঙ্গ – ঢেকে যাওয়া নতমস্তক যৌবন, প্রশ্নহীন দীর্ঘ সময়গুলো – এই বাড়ি থেকে বেরোন সকাল – অসাড়ের এক উজ্জ্বল বাল্ব আমাদের শরীর থেকে আলো চুষছে

অসাড় একধরনের গহ্বর
জিভের মধ্যে সেঁধিয়ে থাকা এঁটেল মাটি
একধরণের অন্ধত্ব, মডেল হৃৎপিণ্ড
জালিকাকার ফুসফুস
সমস্ত রকমের চলাচলের ঊর্ধ্বে
অসাড় একধরনের রক্ত ও তাকে বহন করা উচ্চকিত সুড়ঙ্গ
খাদ্য ও খাদক
অন্ত্র ও তার অসুখ
একধরণের ধনুষ্টঙ্কার
স্পষ্ট বেঁকে যাওয়া
দুটি পেশি থেকে ছিটকে আসা গতি
যাকে তোতলামি বলে জানি

এখানে দিন আর তেমন অস্পষ্ট নয় কেবল না কথা বলা মানুষের ভিড়ে জলফোসকার মত থেঁতলে যাচ্ছে নৈঃশব্দ্য আর আমাদের এতদিন চিৎকারে পরিণত না হওয়া কণ্ঠস্বর ফেঁসে থাকছে পাতলা কাপড়ে যেন এই সময় এক শিকার ধরতে ভুলে যাওয়া কুকুর নিবিড় ঘুম ভেঙে উঠে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখন অসাড় নেই, আমাদের সর্বস্ব জুড়ে পড়ে আছে বালির পরিত্যক্ত সমুদ্র বিলাপ, এভাবেই তৈরি হচ্ছে পূর্বাপরহীন কিছু পাখি যারা রাতের বিভা থেকে স্তন্য পান করে।

এরোপ্লেন থেকে দেখলে রুখা পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নদী
কোনও অংশের জল ঝলসে গেছে
অথবা জমাট রাংতা
খুব নিচে নেমে গেলে পারাপারের অসম্ভবতা বোঝা যায়

এভাবেই অক্টোবর ও তার দ্রুত ফুরিয়ে আসা ধর্মীয় অছিলা কোনও বিরাট মন্দির বা কপালে চওড়া বিভূতি ও চন্দন লাগানো সন্ন্যাসী নয় বরং এক খোলামেলা বিসর্জন শেষের প্যান্ডেল – ছোট শহর এক গানের বদ্ধ বাক্স – জিভ ও অস্থিরতা জুড়ে থাকছে শুধু নারকোলের মিষ্টির স্বাদ ও পুরনো রাস্তার প্রতি বাষ্পশ্বাস – এখানেই অসাড় লুকিয়ে – আঁচড়ে কেটে রাখছে রাস্তা

আমি এভাবেই টের পাই স্পষ্ট পুরনো সভ্যতা আসলে অহং মাত্র – অস্বীকারের গায়ে টাঙিয়ে রাখা ধ্যাবড়া রং – অক্ষরশূন্য আমরা সংকুচিত একটুকরো রুটির মলিনে

অথচ আমরা জানতাম কীভাবে বারবার সম্পর্কের কাছে নেমে আসা মাথা থেঁতলে যায় সিদ্ধান্তহীনতায়, জানতাম কীভাবে অসাড় মাকড়সার পদক্ষেপে ঘেঁটে দেবে ঝরাপাতা ও শান্ত জলে ডুবে থাকা চালতা ফুলের ঘোরে ভরে থাকা ঘুম – কিছু লোক দেখতে পায় অ্যালুমিনিয়ামের চাকতি থেকে বেরোন আলো চৈত্র ও তার পবন সমেত কেউ জঙ্গলের দিকে গেছে; তারা ফিরল কিনা স্পষ্ট নয় শুধু গুলিয়ে যেতে থাকে স্বপ্নে দেখা টগর ও নদীখাতের শুষ্কতা

আকস্মিক আবিষ্কার করে নেওয়া বহুতলরাশির মাঝখানে অখ্যাত প্রাচীন দরগা কি আমাদের কিছু বলতে চাইছে? পীরের নাম বা পড়তে না পারা ফার্সি অক্ষর? এখানেই অসাড় নির্মিত উৎসব, রোশনাই পাকানো শিরা,
চারপাশে শুধু ঠাণ্ডা বিলাপ,
রঙিন জলজ প্রাণী,

স্থির ও প্রাচীন
কিছুতেই যাদের সূর্যের কৌতুহলের সামনে পড়তে হবে না

এই যে মারাত্মক হিংসা লুকিয়ে রাখা, পরপর শুধু আক্রমণ শানিয়ে তোলা সকাল থেকে, শুকনো মাটিতে বারবার আঁচড়, সাম্রাজ্য অথবা ধুলো একসঙ্গে এগোন, দুপুর নামক এক আগুনের মিনারের দিকে – কেউ এখানে সেই ছায়ার কুয়ো খোঁজার কথা বলে গেছে, যেখানে তার সর্বস্ব ডুবেছে

আমি শুধু চারপাশে পুরুষ দেখছি, কোনও বন্দুকের ছায়া আমার কাঁধে লেগে নেই তবু আমি ঘসে তাকে তুলতে চাইছি, এক তীব্র নারীহীনতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে এই দেখাগুলোয়, যেভাবে মরুদেশে দুপুরের আকাশের রঙে একটা ছাইভাব থাকে

এইখানেই অসাড় অপেক্ষা করে – নৈঃশব্দ্য একধরণের পুরনো গাছের ঝুরি – শিশুরাতে মায়ের চুড়ির শব্দে ভেঙে যাওয়া ঘুমের মত পুনরায় নিশ্চিন্ত হয় – থেঁতলে যাওয়া মাথাগুলোর হিসেব থাকে না, অসাড় ধীর থাবায় বালি আঁচড়ায়

হাঃ এই দেশ ও তার ধমনীবিন্যাস!
সহস্র দাম্পত্য ও তার অভ্যাসের সন্তান
ভরে উঠছে শরীরে ছড়িয়ে থাকা অজস্র বীজ
এই বিরক্তি, ঠেসে রাখা কেঁচো গন্ধের মাটি
আমি বহন করছি মুখে

স্পষ্ট এগোই, হাত পা কাঁপে, এই কোলাহলের দেশে পায়ে লুটোয় শব্দ ও তীব্রতা বলার বা শোনার নয় শুধু দৃশ্য বড় হয়ে ওঠে, গিলে নেয় যাবতীয় অভিঘাত, আমার প্রত্যাঘাত ক্ষমতা; অন্ন- বস্ত্র সম্ভাবনা দৃশ্যের চকচকে কাপড় হুমড়ি খেয়ে নেমে যায়, আচমকা হোঁচটে পতিত শিশুর সামনের মাঠের মত, শুকনো ঘাসের গন্ধের মাঝে উঠে দাঁড়াবার অছিলা দরকার নেই তবু দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না। যেভাবে চারপাশ থেকে প্রতিনিয়ত পিঁপড়ের মত বেরিয়ে আসা বেঢপ চেহারার কালো মেয়েদের জিজ্ঞেস করলে জানতে পারি তাদের পছন্দের কোনও ভাগ নেই; যেভাবে তারা ঘর মোছা বা বাসন মাজাকে চিহ্নিত করে ভাল লাগা হিসেবে

আর এইখানে বসেই আবিষ্কার করে নেওয়া যাবে মুখ, আহত বা অপমানিত, ঝড়ে বা উন্নয়নে হারিয়ে যাওয়া, বিক্রি করে দেওয়া আত্মীয়ের মুখ, তাকে সহজেই ধরে ফেলা যাবে, জবরদখল করা যাবে, মেরেও ফেলা যাবে কোনও কৈফেয়ত না দিয়ে

এখানে অসাড় এসে আলতো হাত রাখবে আমাদের মাথায়, ছায়ার মত এক উপস্থিতি আমাদের ভুলিয়ে রাখবে এই তালগোল পাকানো যন্ত্রের শরীরে যাকে শহর বলে ডেকেছি; এক নাছোড় বদান্যতা যায় দুঃশব্দে ঘুম ভেঙে উঠে বেরিয়ে পড়েছি প্রতিদিনের মত, বয়ে চলেছে, সরীসৃপের চলনে, শামুকের চলনে, মাকড়শার চলনে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে এক সমাহিত হত্যালীলার দিকে, আমায় হয়ত কেউ কেউ বলতে চাইছে এভাবে নয়, অথচ সে আঁকড়ে আছে আমাদের প্রতিরোধহীনতা, আমাদের বহুদিন উচ্ছ্বাস না দেখা চোখ যে আরাম চেয়েছে তাই তো আছে তার কাছে... কথা নয় শুধু দৃশ্য ও তার দিগন্তব্যাপী মোহ, শুধু অসাড় ও তার সীমানা উজাড় করা স্থিরতা...

না, তুমি দেখতে পাওনি নাকি দেখতে চাওনি দীর্ঘ সজল বাগানের মধ্যে দিয়ে যে শরৎ বিকেল তার গায়ে জমা হচ্ছিল হিংসা, মাংস কাটা পর্যন্ত, চামড়ায় আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করে গেছ, নিজের ঠোঁটে ঝুলে থাকা রক্তের ডেলা, পেটে লুকনো বিবমিষা, ছড়িয়ে থাকা গা ঘিনঘিন গলির থকথকে মানব ও জান্তবের দিকে দেখতে চাও না তুমি, যে রাস্তা দীর্ঘ এবড়ো খেবড়ো বমি করে দিয়েছে গ্রামের পর গ্রাম, তীব্র হয়েছে মানব সংখ্যা – সহস্র জনস্রোত ক্রমাগত শহরে আসছে – তুমি তাদের সংখ্যা ভেবেছো, সামনে ঝকঝক করছে তোমার না দেখা আর তার ওপর অসাড় তার তোমাকে বশ করছে

আমি আমরা ক্রিয়াপদ
খাবার টেবিলে ছড়ানো
আমার ব্রাহ্মণ ভাষা
জানলা ও ভাষাবিজ্ঞানের রক্তে
প্রবাহিত চির- অব্রাহ্মণ দেশ কাচের টুকরো

ক

আমরা রক্তে অনুভূত কাচের পৃথিবী দূরে ঠেলে দিই

খ

আমরা অসাড়প্লাবিত টেবিল ও তার ব্রাহ্মণ ভাষাক্ষেত্রের বুকে আরেকটু সময় নামক মোম রাখি, (তাতে কি উত্তাপ আসে?) এই অক্টোবর প্লাবিত দুনিয়ার রং পুরনো ব্যবহৃত মোমবাতি – আমরা অপেক্ষা করি

যাতে আমার মা তার অস্পষ্ট গর্ভ নিয়ে এখানে সামান্য ব্রীড়ায় বাবার সামনে দাঁড়ায় যাতে আরেকবার তলপেটে লাথি ও ভাষার শরীরে আরেকটা সংখ্যা ছড়িয়ে যায়

গ

এই বিস্তৃত ভাষাক্ষেত্রের সামনে মা ও তার গর্ভ আসলে এক গোপন দেশ। আমি এক কাঠের টেবিলে ব্যাপ্ত মোমের আলো

ঘ

আমি আর সময় ক্রমাগত ভেসে যেতে থাকি, আমি আর আমার মায়ের ব্রীড়া দুজনে মিলে মায়ের অযৌনতায় ধাক্কা দিতে থাকি, এভাবেই আরেকপ্রস্থ ভাষা ছড়িয়ে পড়ল বাদামি ফোঁটায়, ডাক্তারের অ্যাপ্রনে

ভারি শব্দের পেরেক গাঁথা ভাষা
অভিধানে না ওঠা চলিত অর্থ
রক্তে বহন করা দৃশ্য- টুকরো
আবেগ ভাসিয়ে রাখা রচনাশৈলীর ফাতনা

তুমি জানতে কীভাবে স্বপ্নের ভিতরে নীল একটুকরো নদীখাতের উপলখণ্ড রেখে আসতে হয়। আমার বাঁচা ফিসফাসের মধ্যে টানটান এক নৌকার পালের মত, আমি জানি এই আগুন সমুদ্র থেকে কোনও পশু কেউ তুলে আনবে না আমাদের শান্ত চাউনিতে ঝলসে নেবার জন্য – অথচ আমি তোমাকে বাধ্য করব এই দেশ, শহর ও বিস্ফার – এই প্রবণতাহীন হত্যানন্দে যে বালক স্তব্ধ পোশাকের নন্দন রেখে যাচ্ছে, আমি জানি তার সামনে এই বিকেল ওপচানো সন্ধেগুলো কোনও উপহার নয়। প্রতিহত যে দরজা তোমার সামনে তাকে আমি নিপুন বন্ধ বলে ডাকছি – তোমার স্বর ভারি পদক্ষেপে কেঁপে ওঠা কোনও বিস্মৃত গভীর জল, আমি তার সামনে ক্ষয়ে আসা এক প্রতিরোধ। এই শ্মশানদীর্ঘ চলার সামনে যতগুলো পোড়া বসবাস ও চলন তাদের মধ্যে ঈশ্বরগন্ধী পাথর, যৌন স্যাঁতসেঁতে অগাস্ট- শ্যাওলা – আমরা নীচু হয়েছি, তুমি আঙুলে তুলেছো ভিজে গাঢ় ছাই রং, এরপর শুধুই পশুভ্রূণ- কুঁকড়ে থাকা আর কিছু নেই অসাড় ক্রমশ মেলে দিয়েছে রঙিন সামিয়ানা। গোটা শহর বয়ে যাচ্ছে গ্রাম থেকে পোকা আনতে, অথচ আমার তেমন কিছু নেই, বন্ধুরা বিশ্বাস করতে চাইবেনা এই দৃশ্য, শুধু তীব্র অসাড়ের জ্যোতিপ্রকাশের মধ্যে শরীর জুড়ে বেড়ে ওঠা জ্বর ও বমিভাব লুকিয়ে দেখতে পাচ্ছি ভিজে ছাইয়ের দাগ ধরে ঘসটে চলে গেছে আমাদের ভাষা, আমরা স্বীকৃতি দিইনি দূরের লেখা।

আমাদের স্তব্ধতা ও বিরোধের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে এই সময়ের কন্দমূল, আমরা সব ভুলে থাকার চেষ্টায় ফুটিয়ে তুলেছি মাটির বিকৃত মুখোশ – যেন অন্য কেউ নজর না দিতে পারে – আর যে শিশুটি ধুলো তার মাঠ বরাবর মেলে দিচ্ছি অতীত রঙের আশ্বিন, যাকে মায়াবী নাম দিয়ে বাংলার আয়নায় ঠেসে দিয়েছি আমরা। সেই আয়না আমাদের নিয়ে ফেলছে পরপর মানুষ ও বসতি ঠিকরে দেওয়া সর্পিল রাস্তা যাকে পথ বলে ডাকতেই মসৃণ হয়ে যায় গাঢ় কালিতে লেখা পুরনো পোস্টকার্ড – বন্যা বা সন্তান জন্মের খবর। একগুচ্ছ মরা পাতার মধ্যে দিয়ে শামুক রঙের বিকেল, তার শরীরের গন্ধ মিশিয়ে দিচ্ছি চিৎকারে যা এতদিন কাচের জানলায় বাষ্প হয়ে ছিল।

যখন অসাড় ওঠে এই দৃশ্যসমূহের ওপর, আমি স্থির দাঁড়িয়ে থাকি উঁচু এক বাড়ির ছাদে, আমার অন্তরতম ভয় আমাকে ধর্মের ঘন্টাধ্বনি শোনাচ্ছে, আর ছিটকে উঠছে রাস্তার স্পিডব্রেকারে কোনও তরুণ যুগল, মেয়েটার বুক ঘষটা লাগলেও গতির শরীরে কোনও যৌনতা থাকে না – আমরা পরপর ভেসে যেতে থাকি, ঠিকরে উঠতে থাকি জনপ্রিয় গানের পরিধিতে। আমরা স্পষ্ট দেখি কীভাবে ইঁদুর ঢুকে তছনছ করে দিচ্ছে আমার কাঠের মস্তিষ্ক, চুপ করে দেখে যাব যেভাবে জীবনী আমার মধ্যে চালান করে দিয়েছিল শেষ ট্রেন ঢোকার আগে বালিগঞ্জ স্টেশানের অন্ধ ভিখারিদের খাওয়া বা সকালের শহরগামী এক ট্রেনের শিশু শ্রমিকে ঠাসা কামরা।

আমি জটিল কল্পনায় ঢুকে যাওয়া আমার জীবনেরই অংশমাত্র। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আমার সামনে যে ভূখণ্ড তা কোনওভাবেই কোনও শূন্য থেকে শুরু করা ভাগ্যবিজয়ীর নয়। অথচ সেভাবেই কেউ তলিয়ে যাচ্ছে পোষা গুন্ডা, ফ্লাইওভার, বস্তি ও কংক্রিটের গলিতে চলা গুলির শব্দে, এবড়ো খেবড়ো ভাষাবিন্যাসের মধ্যে এই চিরশান্তির দেশ, এই শান্তিপূর্ণ, শান্তিময়, শান্তিরঞ্জিত দেবশঙ্কুল দেশে প্রতি ঘরে অন্ততঃ একবার ধর্ষণ হয়েছে; প্রতিটা শহর যখন নিজস্ব ঘায়ের ওপর অসাড় করে দেওয়া সিনেমার প্রলেপ লাগায়; প্রতিটা ফ্লাইওভারের নিচে কাদা রঙের খাবারের উপরে ক্ষুধার্ত দাঁত, ভোরের মুখে হিংস্র যৌনমিলন, আমার দম বন্ধ হয়ে আসে, আমার কিস্যু করার নেই ভেবে গোষ্ঠী নামক শব্দটাকে ব্লেড দিয়ে কাটি অভিধানে। উপর থেকে দেখি প্রবাহ বা সময়ের অন্যান্য চিহ্নের গায়ে আমাদের ছায়া ঘষছে, ছায়া ও তার উড়িয়ে চলা ধুলোয় কোনও দেশ গাঁথা নেই।

বারবার বলছি সরে আসার কথা, আমার ভাষা ও স্তব্ধতা, সমস্ত রকমের মাংসল কামড় যেখানে উগরে দিয়েছে সহজাত, উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর ছড়িয়ে থেকেছে হজম না হওয়া খাবারের দুর্গন্ধ নিয়ে আমার চাতুর্য। ভাষা ও দেশজ শব্দের মধ্যেকার ব্রাহ্মণ্য দূরত্বকে অস্বীকার করার মত সজোরে গিলে নিচ্ছি আমার ইচ্ছে,

বলছি হ্যাঁ আমার প্রতিটা জনপ্রিয় গানের লিরিক লিখতে ইচ্ছে করে, হ্যাঁ স্তনসন্ধির লোভই আমার মাংসল আত্মা আর তোমরা মেতে উঠছো উৎসবের সহজে, চেটে চলেছো উৎসবের সাদা আলোর গুঁড়ো, নিশ্বাসে টানছো তাকে, টেবিল থেকে সারিবদ্ধ সাদা গুঁড়ো

ছায়ার মাতৃভাষা এই থেমে থাকা। আমার প্রতিটা চিন্তাসূত্রের পিছনে একটা শীর্ণ নদী, গ্রামহীন বসতিহীন কিছু চিন্তাস্রোত, যাদের সঙ্গে কথা বলা যায়নি শ্রেণী বিভাজনে, প্রতিনিয়ত বিভেদরেখা আমাকে নিয়ে ফেলেছে দর্শকের ভূমিকায়, অথবা সন্ধানী খাতায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে – আমি সেই দূরত্বের ধাতব গন্ধ চুষে নিই; ভাবি কীকরে চলে গেল আমার ভাষা, আর এখানেই ভেঙে আসে আমার অস্তিত্ব আমি চিৎকার করে বলতে চাই আমার ভাষা বলে কি কিছু বাকি নেই; আমার শরীরে শুধু ছড়িয়ে রয়েছে বহনের চিহ্ন, আঁচড় ও ভারি হয়ে থাকা থকথকে প্রতীক্ষাপুঞ্জ, হাঁ- মুখ, কাঠবাদামের গাছ, শরৎ ও উগ্র অসাড়

=x=x=x=